History and Heritage, Journal of the Department of Islamic History and Culture, University of Dhaka
ISSN: 3008-1653; Vol. 01, December, 2024; DoI: 10.70775/HnH/V010005

বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষানীতি প্রণয়নে মেকলের প্রভাব

(Influnce of Macaulay in the Formulation of Western Education Policy in Bengal)

এইচ. এম. জালাল উদ্দীন চৌধুরী*

Abstract:

The East-India Company government tried to appease Bengal by establishing first the Calcutta Madrasa in 1781 and the Benares Sanskrit College in 1792. The nature of teaching in both the institutions, religious and secular, enabled the state to make both the Hindu and Muslim communities of the country understand the purpose and importance of education, while the goal of education for the individual was mainly self-improvement and global improvement, the state's objective was quite different. The main aim of the state intervention was to create a dedicated attendant class of the state. Those who will work for the rulers in revenue, justice and other matters. As a result, a special class was being integrated through education in company-ruled Bengal, not as a nation. Although the development of such education could be seen as enlightening, but it could not play a role in creating the context for a social and cultural revolution. Rather, education itself became a social dividing line. The literate-illiterate class gap developed under British rule was unprecedented. At the initial stage, the company government expressed reluctance to take responsibility for the education of Indians, but the Court of Directors and Member of Parliament Charles Grant formed an evangelist movement called the Clapham Sect and continued to pressurize Parliament to carry out missionary activities on Indians. However, after 1823, the Anglo-Orientalist conflict between Indian education and Western advanced literature and science practice began. According to some anylizer, the crisis between the Anglophones and the Orientalists in this dispute is not mainly about the purpose of education but about its means. The inclusion of C. E. Trevelyan and T. B. Macaulay on the Education Committee in 1834 combined utilitarian and evangelical approaches to educational problems. Besides, the position of the Anglicist party also became very strong. As a result, the negative impact of British attitude towards Indians became very evident. Finally, in 1835, Macaulay's proposal was accepted. The main theme of which was to create a loyal class of so-called literates in English education. Whose devotion to Lord will be eternal and full of gratitude. Who will not care about the loss of the value of their own land, but will always be busy with the gains of the British Empire. The cause of which was by no means spiritual but entirely material. Besides, in 1837 the perfect combination of the state language replaced Persian with English.

মূল শব্দ: পাশ্চাত্য শিক্ষানীতি, মেকলে, বাঙ্গালী শিক্ষিত শ্রেণি।

ভূমিকা:

ভারতীয় উপমহাদেশে শিক্ষার মূল্য সম্পর্কিত ধারনাটি ছিল যেমন উচুঁ মানের, তেমনি এর ইতিহাস ছিল সুপ্রাচীন। আর্যরা ছিল একটি ভাষাভিত্তিক গোষ্ঠী। তারা স্থানীয়দের চেয়ে নিজেদেরকে জ্ঞানী মনে

* লেকচারার, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ই-মেইল: hmjalal@du.ac.bd

করে অহমিকায় ভাসতো। পরবর্তীকালে যারা এসেছে- তুর্কী, মোগল, পাঠান, ইংরেজ সবারই মানসিকতা ছিল প্রায়ই অভিন্ন। ফলে বহিরাগত ও স্থানিক দুই গোষ্ঠী মিলে কখনো অভিন্ন জাতিভিত্তিক সংস্কৃতির সম্মিলন ঘটাতে পারেনি। ইংরেজপূর্ব সময়ে এদেশীয় শিক্ষার প্রাথমিক ভিত্তি ছিল টোল ও মক্তব কেন্দ্রিক। ব্যক্তিগত উদ্যোগে নিজস্ব কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য দক্ষতার তাগিদে শিক্ষার আয়োজন করা হত। দেখা যেত হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে অনেকে ফার্সী ভাষায় তালিম গ্রহণ করত। ব্রিটিশদের আগমনের পর নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা এদেশীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন নিয়ে আসে। ব্রিটিশ সংস্কৃতিতে ভাষা ও অক্ষরজ্ঞানের উপর গুরুত্ব দেয়া হত। তাদের কাছে এটি ছিল সাহিত্যগত ভাবজগতে পৌঁছানোর সোপান। তারা এদেশে ভূগোল, বিজ্ঞান, ইতিহাস নিয়ে আসে। কিন্তু এর মাধ্যমে বোঝাতে চাইতো নিজেদের ইতিহাস, নিজেদের ভূগোল, নিজেদের শিক্ষা ও জ্ঞান। এদেশীয় জনগণ শিক্ষিত হোক এ রকম মনোবৃত্তি ব্রিটিশদের কখনো ছিল না। গোড়া থেকে তাদের উদ্দেশ্য ছিল শাসন-শোষণের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটোনো। সে লক্ষ্যে এমন শিক্ষা পদ্ধতি এদেশে চালু করা দরকার, যাতে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে শোষণ করার ব্যাপারে সেটি ইংরেজদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ অভিপ্রায় অনেকটা প্রকাশ্যে থাকায় নতুন করে জেগে ওঠা হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা তৈরি হয়, যা ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদী চেতনা এবং সাম্প্রদায়িক মানসিকতা সৃষ্টিতে নিয়ামক ভূমিকা পালন করেছিল। বলা বাহুল্য এর পেছনে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী উষ্কানিদাতার ভূমিকা পালন করেছিল।

উপমহাদেশে বৃটিশ শিক্ষানীতির প্রভাব ও প্রসার নিয়ে ইতোমধ্যে বেশকিছু গবেষণাকর্ম সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু তাঁদের গবেষণা কর্মে বৃটিশ শিক্ষানীতি প্রনয়ণে মেকলের প্রভাব বিষয়ে পূর্ণাঙ্গরূপে তেমন কোন তথ্যাদি সন্নিবেশিত হয়নি। এজন্য আমি মনে করি উক্ত বিষয়ে একটি নতুন গবেষণার যৌক্তিকতা ও সুযোগ রয়েছে। যেসব ঐতিহাসিক ও গবেষক উক্ত বিষয়ে গবেষণাকর্ম সম্পাদন করেছেন তাঁদের মধ্যে G. M. Young, C. E. Travelyan, Sir E. Rayan, T. G. P Spear P Hartog অন্যতম। উক্ত গবেষনা কর্মের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে বিভিন্ন Minutes, Despatch, Parliamentary Papers, Reports এবং তৎকালিন সংবাদপত্র সমাচার চন্দ্রিকা, সমাচার দর্পন, বেঙ্গল হরকরা ইত্যাদি পর্যালোচনা করে বর্তমান গবেষণা কর্মটি রচনা করা হয়েছে। এ প্রবন্ধটি বৃটিশ শিক্ষানীতিতে মেকয়েলের প্রভাব অনুধাবনে সহজতর করবে বলে মনে করি।

বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষানীতি প্রণয়নে মেকলের প্রভাব বিশ্লেষণ

ব্রিটিশদের এহেন মানসিকতার প্রথম সূত্রপাত ঘটেছিল কলকাতা মাদ্রাসা ও বেনারস সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এবং হিন্দু-মুসলমান এই দুই শ্রেণির জাতি গোষ্ঠীকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আলাদা প্রতিদ্বন্দ্বি শ্রেণি হিসেবে চিহ্নিত করে দিয়ে। বাহ্যত প্রক্রিয়াটি ছিল রাজস্ব ও বিচার প্রশাসন সম্পর্কিত কার্যক্রমে নিম্ন পর্যায়ের পদসমূহ পূরণের মাধ্যমে সরকারের প্রয়োজন মেটানো। কিন্তু এতে করে আন্তঃ সাম্প্রদায়িক, সামাজিক কাঠামোতে পুরোনো বৈষম্যে নতুন একটি মাত্রার সংযোগ ঘটেছিল। তা হল ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অর্জন এবং কর্তৃপক্ষের সহায়তায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া। অর্থাৎ যারা পাশ করবে তারা নিজেকে অত্যন্ত বিশিষ্ট ও ভাগ্যবান মনে করবে। বস্তুত শিক্ষা ভিন্ন অন্য কোন পুঁজি সমাজে বিদ্যমান না থাকায় এ শিক্ষাক্রম জনগণকে কোনভাবেই ঐক্যবদ্ধ করেনি, বরং বিচ্ছিন্ন তো বটেই এমনকি পরমুখাপেক্ষিও করে তুলেছিল। এই মুখাপেক্ষিতা শুধু ছাত্রদের বেলায় নয়, শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রতিফলিত হয়। একজন ইন্সপেক্টরের বেতন যেখানে প্রায় পাঁচশ টাকা, সেখানে প্রাথমিকের

শিক্ষকদের বেতন ছিল মাত্র পাঁচ থেকে দশ টাকা।[১] এটা অনেকটা কৃষি ব্যবস্থার মতো, কৃষক তথা প্রকৃত উৎপাদক শ্রেণি পেত সবচেয়ে কম মূল্য। বস্তুত বৃটিশদের শিক্ষানীতির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয়দের অধীনস্থ রেখে এদেশে বৃটেনে উৎপাদিত পণ্যের বাজার সৃষ্টি করা। অর্থাৎ জাতীয়তাবাদী চেতনাকে উৎসাহিত না করে বরং তাকে ধ্বংস করাই ছিল মূল লক্ষ্য। যা মেকলের বক্তব্যে চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছিল। তিনি বলেছিলেন শিক্ষার মধ্য দিয়ে ভারতীয় বিশেষতঃ- বাঙ্গালি সমাজের ভেতর থেকে এক নতুন শ্রেণি বের হয়ে আসবে যেটি রক্তে ও বর্ণে স্থানীয় থাকলেও রুচি, ধ্যান-ধারণা, নীতি-নৈতিকতা ও বিচার-বুদ্ধিতে হবে ইংরেজ।[২] মোদ্দাকথায় বাঙ্গালিদের মধ্য থেকে মানুষ নয়, দালাল শ্রেণি সৃষ্টি করে এবং শোষণের স্বার্থে শিক্ষার মাধ্যমে একটি নতুন সমর্থক গোষ্ঠী তৈরি করে তাকে নিজ জাতির বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেয়াই ছিল আসল অভিপ্রায়। কারণ বাঙ্গালি সম্পর্কে মেকলেসহ ইংরেজ সমাজের অনেকের ধারণা ছিল অত্যন্ত হীন প্রকৃতির এবং বাঙ্গালিদের প্রতি ঘৃনা ছিল প্রচণ্ড রকমের। তাদের মতে বাঙ্গালিরা আপাদমস্তক প্রতারক, কথার বরখেলাপকারী, মিথ্যা ও কপটতার মধ্যেই সদা-সর্বদা নিজেদেরকে আচ্ছাদিত করে রাখে।[৩] এসবের সাথে যোগ করে বলা হয় বাঙ্গালীরা ভীরু, কাপুরুষ, সম্মানহীন জাতি, বারংবার ভিনদেশিরা তাদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে, দেশ, সভ্যতা বিলীন করে দিচ্ছে, অগনিত মৃত্যু ও মান-সম্মান লুণ্ঠিত হচ্ছে, অথচ তারা এসব দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। প্রত্যাঘাত করা, নিজকে, সমাজকে, দেশকে রক্ষার চিন্তা-চেষ্টা কোনটাই বাঙ্গালির মধ্যে পরিলক্ষিত হয়নি।[৪] লক্ষ্যণীয় যে, প্রাচীনকালে লুটেরা, হানাদার আর্য-মনোভাবের সাথে আধুনিকতার লেবাসধারী ব্রিটিশদের মানসিকতার কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। অবহেলিত জাতি হিসেবে স্থানীয়দেরকে আপন স্বার্থসিদ্ধির কাজে ব্যবহার করার ক্ষেত্রেও দু'গোষ্ঠীর মধ্যে কোন তফাৎ দৃশ্যমান ছিলনা।

অবশ্য এর বিপরীত ধারণাও কিছু ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। ব্রিটিশদের মতে কোম্পানি শাসন-শোষণের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে আগমন করেনি। ভারতীয়দের উন্নত করবার লক্ষ্যই ছিল ব্রিটিশ শাসনের মুখ্য উদ্দেশ্য। ফলে চিরস্থায়ী ভূমিব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এদেশে জমিদার, বণিক ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব হয়। তারাই ক্রমান্বয়ে কোম্পানি শাসিত সমাজের ভিত্তি এবং অর্থনৈতিক জীবনের মেরুদণ্ড হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ইংরেজ সৃষ্ট ভূমি-ব্যবস্থাপনা ও সরকারি চাকুরির উপর নির্ভরশীল এ শ্রেণি ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে পাশ্চাত্য ভাবধারা ও জীবন দর্শনের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতে থাকে। এতে করে আধুনিক যুগের জাতীয় রাষ্ট্র ও জাতীয়তাবাদী চেতনায় সমৃদ্ধ পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য বিকাশ লাভ করতে থাকে। ব্রিটিশ আগমনপূর্ব ভারতবর্ষে যা ছিল একেবারে অনুপস্থিত। তাই বলা হয় পাশ্চাত্য প্রভাবেই আধুনিক প্রগতিশীল ভারতবর্ষ বিনির্মানের সূচনা হয়েছিল। অবশ্য ঊনিশ শতকের প্রারম্ভিক পর্যন্ত এ শ্রেণি গঠিত ছিল প্রধানত হিন্দুদের দ্বারা। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অনেকটা বাস্তবধর্মী এবং একই সাথে বেশ পুরোনোও। বহু বছর ধরে শাসিত মুসলিম রাজত্বের সরকারি ভাষা হিসেবে ফার্সী শিখতে হিন্দুরা কখনো দ্বিধা করেননি। শুধু তাই নয় অনেক হিন্দু মুসলমানদের ধর্মীয় ভাষা আরবিতেও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন।

ভারতবর্ষে ইউরোপীয় বণিকগোষ্ঠী, বিশেষত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আগমনের পর থেকে এদেশীয় হিন্দু সমাজ বাণিজ্য প্রসার এবং ভাষা রপ্ত করা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বিবিধ সুযোগ-সুবিধা আয়ত্ব করবার ব্যাপারে বেশ সচেতন হয়ে উঠেছিল। আঠার শতকের শেষাংশে এবং ঊনিশ শতকে সূচনালগ্ন থেকে ইংরেজি ভাষার প্রতি হিন্দুরা প্রচণ্ড রকমের উৎসাহী হয়ে সমকালিন ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং উদারনৈতিক যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী চিন্তা-চেতনার প্রতি পরিচিত হবার সক্ষমতা লাভ করে। তবে

নেহায়েত বাস্তবতায় বঙ্গীয় হিন্দু সমাজ বিশেষত নগরবাসী হিন্দুরা ইংরেজি ভাষায় জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে যে প্রয়াসী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তার সুদূর প্রসারী ফলাফল সম্পর্কে অনেকেই ওয়াকিবহাল ছিলেন না। তাই ১৮১৬-১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু যুবকদের মধ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতা-সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষার মাধ্যমে মানসিক চেতনা জাগ্রত করা।[৫] পক্ষান্তরে মুসলিম রাজশক্তির উপর মুসলমান সমাজের আধিপত্য নির্ভরশীল থাকায় মুসলমানরা বিচার বিভাগ ছাড়া ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রতি উদাসীন ছিলেন। পলাশী পরবর্তী সময়ে সে শক্তি যখন ভেঙ্গে পড়ল, তখন তার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা আর্থ-সামাজিক কাঠামোগুলোতেও ভাঙ্গন দেখা দিল। ফলে ইংরেজ শাসনকে হিন্দু সমাজ স্বাগত জানালেও মুসলমানরা একে বিপর্যয় মনে করে এর থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলতে শুরু করে। যা হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের উন্নয়নের ক্ষেত্রে গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছিল। ফলশ্রুতিতে হিন্দু-মুসলমান সমাজের মধ্যে ব্যবধানও অনেকখানি বিস্তৃত হয়। ইতোপূর্বে মুসলমান আমলে তারা যেসব সুবিধাদি ভোগ করে আসছিল তার সবই দ্রুত হারাতে থাকে। ১৭৯৫ সালের ২২ জুন স্যার জন শোর তার লিখিত বিবরণীতে উল্লেখ করেন যে, কোম্পানির কর্মচারিদের দ্বারা পরিচালিত প্রশাসনে পুরোনো মুসলিম শাসকদের অনেক পরামর্শদাতা ও তাদের পোষ্যরা ক্ষমতা, প্রতিপত্তি এবং তার সাথে যুক্ত সুবিধাসমূহ হারিয়ে ফেলে। এতে করে অনেক অভিজাত বংশীয় পরিবার যারা একসময় বিত্তশালী বলে গণ্য হত, তারা বিত্ত-প্রতিপত্তির উৎস থেকে বঞ্চিত হয়ে দারিদ্য সীমায় নিমজ্জিত হয়।[৬] উপরন্ত ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠা পাবার ফলে সর্বাধিক ক্ষতির সম্মুখীনও হয়েছিলেন বাংলা তথা গোটা ভারতবর্ষের মুসলমানরা।[৭] এখানে ঐতিহাসিক উইলিয়াম হান্টারের বক্তব্যও প্রানিধানযোগ্য। তাঁর মতে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, তৎপরবর্তী ঊনিশ শতকের বাঙ্গালি মুসলমানদের আর্থিক দুর্গতি এবং ১৮২৮ সাল থেকে অনুসৃত ভূমি পুনরাধিকার মামলাসমূহ প্রভৃতি কারণে শতশত প্রাচীন মুসলিম পরিবার সর্বস্বান্ত হয়ে যায়। মুসলমানদের গোটা শিক্ষাব্যবস্থা, যা নিষ্কর বা লাখেরাজ ভূ-সম্পত্তির ওপর নির্ভর করে টিকেছিল, সেটির উপরও মরণ আঘাত এসে পড়েছিল।[৮]

কোম্পানি শাসনের প্রথম দিকে রাজস্ব আদায় ও আইন-শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব ছাড়া এদেশীয় বিচার, শিক্ষা, ধর্মীয় ও সমাজ জীবনের কোন অঙ্গনে হস্তক্ষেপ করার ব্যাপারে ব্রিটিশরা তেমন কোন উৎসাহ বোধ করেনি। মুষ্টিমেয় ইংরেজদের জীবন, তাদের বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ ক্ষুণ্ন না হওয়া পর্যন্ত তারা কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে আগ্রহ প্রদর্শন করেনি। তবে ভারতীয় ও ইংরেজ উভয়ে পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও নিশ্চিদ্র ভাবজগতে অবস্থান করা একেবারে অসম্ভব ছিল। প্রশাসনিক-বাণিজ্যিক ও সামাজিক প্রভৃতি কারণে দুই পক্ষের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হতে থাকে। ফলে ভারতীয়দের শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্ব নেবার ক্ষেত্রে অনাগ্রহ থাকলেও ব্রিটেনের শক্তিশালী ইভানজেলিস্ট আন্দোলন ভারতে মিশনারী ও শিক্ষক পাঠানোর জন্য বৃটিশ পার্লামেন্টের উপর ক্রমশ চাপ বাড়াতে থাকে। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট মেম্বার চার্লস গ্রান্ট যিনি কোম্পানির অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও পরবর্তীকালে কোর্ট-অব-ডিরেক্টর্স্ সদস্য ছিলেন, এ আন্দোলনের অন্যতম নেতা। ১৭৯২ সালে লিখিত একটি নিবন্ধ ১৭৯৭ সালে পার্লামেন্টে উত্থাপন করে গ্রান্ট ভারতীয়দের নৈতিক অবক্ষয়ের বিষয়টি তুলে ধরেন, একই সাথে ভারতীয়দেরকে খৃষ্ট ধর্ম সম্পর্কীয় বিষয়াদিসহ প্রয়োজনীয় শিক্ষাদানের জন্য ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা চালান।[৯]

বস্তুত ১৮১৩ সাল পর্যন্ত মিশনারীদের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কিত বিষয়টিতে কোম্পানির মনোভাব বিরোধিতার মধ্যে না থাকলেও কখনো সন্দেহের বাইরে রাখেনি। তাই ভারতীয় ধর্ম ও সমাজের বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার নীতি গ্রহণ করা সত্ত্বেও মিশনারীদের দাবী কোম্পানি অগ্রাহ্য করতে পারেনি।[১০] বিধায় ১৮০০ সালে লর্ড ওয়েলেসলি কোম্পানির তরুণ সিভিল সার্ভেন্টদের ভারতীয় ভাষা ও আইন বিষয়ে

শিক্ষা প্রদানের জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮০৫ সালের মধ্যে প্রায় ১১০ জন ভারতীয় পণ্ডিত এ কলেজে নিয়োজিত থেকে শিক্ষার পাশাপাশি প্রাচ্যভাষার মৌলিক রচনা ও অনুবাদের কাজ সম্পাদন করেছিলেন।[১১] নিঃসন্দেহে প্রতিষ্ঠানটি ভারতীয় শিক্ষার প্রসারে অনেক বড় ভূমিকা রেখেছিল। বিখ্যাত মিশনারী পণ্ডিত উইলিয়াম কেরী প্রথমে শিক্ষক এবং পরবর্তীতে বাংলার অধ্যাপক পদে আমৃত্যু নিয়োজিত ছিলেন। তবে ভেলোর বিদ্রোহ (১৮০৬) মিশনারীদের তৎপরতার ফলশ্রুতি বলে সমালোচনা শুরু হলে ১৮১৩ সালে ব্যাপটিস্ট মিশনারী সোসাইটির যশুয়া মার্শম্যান দৃঢ়তার সাথে উল্লেখ করেন যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসন স্থায়ী করবার ফলপ্রসু উপায় হবে শান্তভাবে ও নীরবে, ধীর ও স্থিরভাবে দেশীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে মহান খৃষ্ট ধর্মের প্রচার করা। এভাবে ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার অনুকূলে স্থায়ী ও সহায়ক সামাজিক ভিত্তি গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়া হয়।

১৭৭৩ ও ১৭৯৩ সালের দুটো চার্টার অ্যাক্ট অনুযায়ী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বিশ বছর করে ভারতবর্ষে অবাধ-বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার লাভ করলেও ১৮১৩ সালের চার্টার এ্যাক্টে কোম্পানির ভারত বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার রহিত করা হয়। পাশাপাশি ১৮১৩ সালের আইনে শিক্ষা বিষয়ক ও মিশনারীদের ধর্মপ্রচার সম্পর্কিত দুটো গুরুত্বপূর্ণ দফা যোগ করে দেয়া হয়। ভারতীয়দের বিজ্ঞান শিক্ষার উৎসাহ দেয়ার তাগিদ দিয়ে বলা হয়- প্রত্যেক বছর উদ্বৃত্ত রাজস্ব থেকে কমপক্ষে এক লক্ষ টাকা সাহিত্যের নবরূপায়ন ও উন্নয়ন, দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিদের উৎসাহ প্রদান এবং ভারতীয় আপামর জনগোষ্ঠীর জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রবর্তন ও প্রসারের নিমিত্তে ব্যয়িত হবে।[১২] অবশ্য এর আগে লর্ড মিন্টো ১৮১১ সালের ৬ মার্চ একটি প্রস্তাবে ভারতীয় শিক্ষার অবনতি এবং এর পরিণতিতে ক্ষোভ প্রকাশ করে দু'টো সংস্কৃত শিক্ষা এবং দুটো আরবি ও ফার্সী ভাষা শিক্ষার জন্য মোট চারটি কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেছিলেন,[১৩] যদিও তা বাস্তবায়িত হয়নি।

১৮১৪ সালের ৩ জুন কোর্ট অব ডিরেকটরস পাশ্চাত্য ধাচের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও শিক্ষাদান পদ্ধতি পরিহার করে শিক্ষিতদের বাড়িতে পাঠদানের ভারতীয় পদ্ধতির প্রতি উৎসাহিত করবার জন্য গভর্নর জেনারেলকে পরামর্শ দেন।[১৪] তাদের ধারণা ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিবর্তে প্রাচ্য শিক্ষাপদ্ধতি ব্রিটিশ শাসন দীর্ঘায়িত করার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখবে। লর্ড ময়রা (হেস্টিংস) ২ অক্টোবর ১৮১৫ সালে এক প্রস্তাবে উল্লেখ করেন যে, ভারতীয় সমাজে বিদ্যমান নানাবিধ কুসংস্কার দূর করা জনশিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হওয়া উচিত। একই সাথে গ্রামীণ দরিদ্র অথচ খুবই প্রয়োজনীয় স্থানীয় শিক্ষক সমাজকে পক্ষপাতহীনভাবে সহায়তা করাও আবশ্যক।[১৫] তবে এসময় ইউরোপীয় মিশনারীগুলো ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে উন্নত ধরনের কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করে শিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে ভারতীয় ধর্মসমূহ সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণে উৎসাহিত করে খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তকরণের অপতৎপরতা চালাতে থাকে। এতে করে ভারতীয়দের মনে বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক সন্দেহের উদ্রেক করেছিল। হেস্টিংস এতে আতংকিত হয়ে উপযুক্ত শিক্ষাদানের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের মনকে উন্মুক্ত করার মধ্যেই মিশনারীদের প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন।[১৬] তবে হেস্টিংসের এ ইতিবাচক মনোভাব সত্ত্বেও সরকারিভাবে উল্লেখযোগ্য কোন উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়নি। তবে তার আমলে বাংলা শিক্ষার উন্নতির জন্য বেশ কিছু স্বাধীন ও বেসরকারি প্রয়াস গৃহীত হয়েছিল। ফলশ্রুতি হিসেবে জুলাই ১৮১৪ সালে খৃষ্টান মিশনারী প্রতিনিধি রবার্ট মে ও শিক্ষাবিদ জোসেফ ল্যাংকাস্টার কর্তৃক উদ্ভাবিত মনিটরিয়াল পদ্ধতির একটি স্কুল চুচুড়ায় প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ পদ্ধতির শিক্ষাদান জনপ্রিয় হয়ে উঠলে ১৮১৮ সালের মধ্যেই ৩৬টি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এসব বিদ্যালয়ে জাত-বর্ণ-ধর্ম-সম্প্রদায়গত কোন বাধাই কার্যকর ছিল না। এসব উদ্যোগের প্রেক্ষিতে শিক্ষার চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং সরকারি উদ্যোগের

ব্যর্থতা হেতু বিভিন্ন মতের-পথের প্রতিনিধিত্বকারী নেতৃবর্গ শিক্ষা বিস্তারে নিজেদের সামাজিক দায়িত্বের প্রতি সচেতন হয়ে উঠেন। ফলস্বরূপ ১৮১৬ সালে কলকাতা হিন্দু কলেজ, ১৮১৭ সালে কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি এবং ১৮১৮ সালে কলকাতা স্কুল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটির ব্যবস্থাপনায় ছিলেন বেশ ক'জন হিন্দু-মুসলিম, খৃষ্টান মিশনারী, ইংরেজ আমলা ও ইংরেজ ব্যবসায়ী। স্কুল সোসাইটিতে মৌলভি মীর্জা কারাম আলী খান, রাজা রাধাকান্তদেব ও দুই জন ইউরোপীয়কে যুগ্ম সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়। বলা বাহুল্য এসব বিষয়ে লর্ড হেস্টিংস ব্যক্তিগতভাবে বেশ উৎসাহ ও সমর্থন প্রদান করেছিলেন।

১৮২৩ সালে কোম্পানি সরকার নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে পুরোনো প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়নের দিকে জোর দেয়। সরকারের নির্দেশ ছিল ফৌজদারী আদালতগুলোর শুণ্য পদসমূহ 'কলকাতা মাদ্রাসার ছাত্রদের দিয়েই পূরণ করা হোক।[১৭] তবে মাদ্রাসার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় কোন সন্তোষজনক কর্মপন্থা পরিলক্ষিত না হওয়ায় এর পরিচালনার বিষয়টিতে বারংবার পরিবর্তন আনা হয়। তদসত্ত্বেও মাদ্রাসাটিকে টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে বিভিন্নভাবে সরকারের উদ্বেগ প্রদর্শিত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, অপরিকল্পিত কার্যক্রমের মধ্যে শিক্ষা গ্রহণের প্রতি মুসলিম জনগোষ্ঠীর সাধারণ অনীহাও ব্যাপকতরভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। অন্যদিকে লর্ড মিন্টো (১৮০৭-১৩)র আমলে তিরহুত ও নদীয়ায় দু'টো সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত না হলেও ১৮২১ সালে কলকাতা মাদ্রাসার হিন্দু প্রতিরূপ হিসেবে কলকাতায় একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[১৮]

১৮২১ সালের ২১ আগস্ট গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তে কলেজ প্রতিষ্ঠার আসল উদ্দেশ্য প্রস্ফুটিত হয়ে উঠে। এতে বলা হয় হিন্দু সাহিত্যের চর্চা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির প্রথম লক্ষ্য হলেও প্রধান কাজ হলো শিক্ষাদানের মাধ্যমে ইউরোপীয় জ্ঞানের ক্রমপ্রসারের জন্য বাস্তব ও গ্রহণযোগ্য প্রক্রিয়া তুলে আনা। যাতে করে উচ্চতর স্তরের শিক্ষিত হিন্দুরা সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় কলা-সাহিত্য-সঙ্গীত-কৃষ্টি ও বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণবোধ করেন।[১৯] বস্তুত এ অভিব্যক্তিটি প্রাচ্যবিদ এইচ. এইচ. উইলসন এর তাত্ত্বিক নীতি-'শিক্ষিত শ্রেণিগুলোর মাধ্যমেই জনগণের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া'র পথটি অনেকাংশে সহজতর হয়েছিল বলে প্রতীয়মান হয়। কেননা পাশ্চাত্য শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান শুধুমাত্র তাদের মাধ্যমে প্রসারিত হতে পারে, যারা প্রাচ্যের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষায় শিক্ষিত[২০] হয়ে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে।

১৮২৩ সালে শিক্ষা বিষয়ে সরকারি মনোভাবে কিছুটা পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। ভারতীয় জনগোষ্ঠীকে উন্নত ও কার্যোপযোগি শিক্ষা দান এবং তাদের নৈতিকতার উন্নয়নে সময়োপযোগি ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কিত মতামত প্রদানের জন্য জনশিক্ষা বিষয়ক একটি সাধারণ কমিটি গঠন করা হয়।[২১] সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সার্বিক কর্মকাণ্ডে তদারকি এবং বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও উৎসাহ প্রদান কমিটির পরিধিভুক্ত থাকলেও রক্ষণশীল নীতির পক্ষে প্রভাবশালী সরকারি কর্মকর্তাদের মতানুসারেই জনশিক্ষা কমিটি তাদের পরামর্শ তুলে ধরতো। এ প্রসঙ্গে জনশিক্ষা কমিটির প্রভাবশালী সদস্য হল্ট ম্যাকেঞ্জি (যিনি টেরিটোরিয়াল বিভাগের দায়িত্বে নিযুক্ত সরকারের সচিব) এর মতামত প্রনিধানযোগ্য। তার মতামত ছিল সরকারের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত হবে যে, শিক্ষিত ও প্রভাবশালী হিসেবে পরিচিত এবং শিক্ষক হবার মত সম্ভাবনাময় ব্যক্তিবর্গকে প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে সরকারের চাহিদানুযায়ী শিক্ষিত সমাজ হিসেবে গড়ে তোলা। পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ পুস্তকাদির অনুবাদ, সংকলন ও প্রকাশের তাগিদ দেয়া। এছাড়া দৃষ্টান্তস্বরূপ সমাজের উঁচু শ্রেণির জনগোষ্ঠী এবং শিক্ষিত সমাজের মধ্যে

উপর থেকে নীচের দিকে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমনভাবে সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন, যাতে করে প্রাচ্যজ্ঞানকে দূরে না রেখে বরং পাশ্চাত্য জ্ঞানের সাথে সংমিশ্রন ঘটিয়ে একক হিসেবে পাশ্চাত্য জ্ঞানের বিস্তার ঘটানো সম্ভবপর করে তোলা। সে হিসেবে তিনি নতুন করে একটি মাদ্রাসা ও দুই বা তার অধিক সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেন এবং জনশিক্ষা কমিটির সেক্রেটারি এইচ. এইচ. উইলসনকে জেলাগুলোতে শিক্ষার অবস্থা অবলোকনের জন্য ১৮২৩ সালের সেপ্টেম্বরে একটি পরিপত্র জারি করেন।[২২]

প্রসঙ্গত বলা যায় উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে ভারতবর্ষ বিশেষত বাংলায় ব্রিটিশ শাসনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে নব নব চিন্তার উন্মেষ ও ধ্যান-ধারনার বিকাশ ঘটতে থাকে। ১৮১৩ সালের চার্টার অ্যাক্টে শিক্ষা বিষয়ক উপধারা যুক্ত হলে এর সরাসরি প্রভাবে এদেশের সমাজ-সংস্কৃতিতে অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ১৮১৪ সালে রবার্ট মে র স্কুল, ১৮১৬ সালে হিন্দু কলেজ, ১৮১৭ সালে কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি, ১৮১৮ সালে কলকাতা স্কুল সোসাইটি ও শ্রীরামপুর সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা, ১৭৯৯ সালে লর্ড ওয়েলেসলি কর্তৃক সংবাদপত্রের উপর নিষেধাজ্ঞা (Censorship) ১৮১৮ সালে লর্ড ময়রা কর্তৃক রহিতকরণ এবং ১৮১৮ সালে রামমোহন রায়ের সংস্কারমূলক গ্রন্থ প্রকাশ প্রভৃতি ইংরেজ কোম্পানি শাসনের ব্যতিক্রমধর্মী চরিত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল বলে অনুমিত হয়। এহেন প্রেক্ষাপটে ১৮২৩ সালের ডিসেম্বরে বৈয়াকরনিক অলংকরণ ও অধিবিদ্যা বিষয়ক জ্ঞান শিক্ষার জন্য সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে পাশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন ও জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্যে আধুনিক কলেজ প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করে দেশবাসীর পক্ষ থেকে রামমোহন রায় লর্ড আমহার্স্ট (১৮২৩-২৮) এর নিকট একটি পত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু কোম্পানি সরকারের প্রাচ্যবিদদের দ্বারা প্রভাবিত কমিটির নিকট পত্রটি গুরুত্বপূর্ণ মনে না হওয়ায় নতুন করে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৩] বলা বাহুল্য সে সময় শিক্ষা-নীতি নিয়ে প্রাচ্যবাদী ও পাশ্চাত্যবাদী বা ইংরেজ পন্থী ও দু' ধারার মধ্যে কিছুটা মতপার্থক্য গড়ে উঠে, মূলত শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্য নিয়ে নয় বরং এর উপায় নিয়ে। তাই রামমোহন রায়ের উদ্যেগের প্রতি সরকারি নীতির সমর্থন থাকলেও জনগণের শিক্ষিত অংশটিকে সরকার তার নীতি সম্পর্কে জ্ঞাত রাখার বিষয়টি অনুপস্থিত রেখে দেয়। ফলে কেউ কেউ বিষয়টিকে এ্যাংলো-ওরিয়েন্টালিস্ট দ্বন্দ্বের অংশ বিশেষ বলে মনে করেন।[২৪] লক্ষ্যণীয় যে ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা অর্জন হলো ধন-সম্পদ লাভের প্রধান হাতিয়ার-এ সত্য অনুধাবন করে কোলকাতার বাঙ্গালি হিন্দুদের উচ্চ-মধ্য শ্রেণি, এমনকি গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যেও প্রবল উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। ফলে রামমোহন রায়ের সংস্কৃত কলেজের পরিবর্তে পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য আধুনিক কলেজ প্রতিষ্ঠার দাবীকে কোন রক্ষণশীল হিন্দুর বিরোধিতার মুখোমুখি হতে দেখা যায়নি। তবে এ বাস্তবতা এবং হিন্দু সমাজের পরিবর্তিত মনোভাব প্রাচ্যবাদীরা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হন।

প্রাচ্যবাদী শিক্ষানীতি বনাম প্রতীচ্যবাদী চেতনাগত বিভক্তির প্রক্রিয়াকালীন সময়ে এক্সামিনার কার্যালয়ের উপযোগবাদী দার্শনিক পিতা-পুত্র জেমস্ মিল ও জন স্টুয়ার্ট মিল-র অন্তর্ভুক্তি ইন্ডিয়া হাউজে নতুন প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল হতে দেখা যায়। ১৮২৪ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি বাংলার গভর্নর জেনারেলের নিকট প্রেরিত কোর্ট অব ডাইরেক্টরস এর পত্রে হোম ডিপার্টমেন্টে নতুন সঞ্চারিত ভাবনার সুস্পষ্ট প্রমাণ ফুটে উঠে।[২৫] এতে কোম্পানি সরকারের বঙ্গীয় শিক্ষা সংক্রান্ত নীতিসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে সমালোচিত হয়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের শিক্ষা সমন্বয়ের উপর জোর দিয়ে প্রাচ্য পরিকল্পানাকে মৌলিকত্ব নির্ধারণে ক্রটিপূর্ণ বলে উল্লেখ করে প্রাচ্য শিক্ষা কার্যক্রমকে সময়ের অপচয় বলে আখ্যা দেয়া হয়। তাদের মতে মহৎ কর্মপদ্ধতি নির্ণয়ে শুধু হিন্দু কিংবা মুসলিম ধর্মীয় জ্ঞান প্রদান কোন কাজে আসতে পারে না, যদি না

তাদের উপযোগবাদী ভাষা ও কার্যোপযোগী শিক্ষা দেয়া না যায়।[২৬] এতদসত্ত্বেও কোর্ট অব ডাইরেকটরস্ কর্তৃক বাংলা সরকারের শিক্ষানীতি অযৌক্তিক মনে না করে জনশিক্ষা কমিটি তাদের পদক্ষেপের মূল্যায়নে উল্লেখ করে যে, যেহেতু হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায় সরকারি শিক্ষা কার্যক্রমের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত, সেহেতু ইউরোপীয় সাহিত্য-বিজ্ঞানকে এই জনপ্রিয় স্রোতের সাথে এমনভাবে সম্পৃক্ত করতে হবে, যাতে করে সরকারের মনোভাব ও ইচ্ছার প্রতিফলন বাস্তবায়ন যাদের জন্য পরিকল্পিত তাদের মনোজগতে কোনরূপ প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার উদ্রেক না ঘটে। শিক্ষা কমিটির এই মনোভাব কোর্ট অব ডাইরেকটরস্ ও বাংলা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হলে শিক্ষা কমিটির কার্যক্রম প্রসারিত হতে থাকে। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে কলকাতা মাদ্রাসা, হিন্দু ও সংস্কৃত কলেজ এই তিনটি প্রধান শিক্ষায়তনে সংস্কারের উদ্যেগ নেয়া হয়। ১৮২৩ সালে এইচ. এইচ. উইলসনকে হিন্দু কলেজের সরকারি পরিদর্শক এবং পরিচালনা কমিটির সদস্য মনোনীত করা হয়। হিন্দু ও সংস্কৃত কলেজের জন্য একটি যৌথ ভবন নির্মাণ শুরু হয়। উভয় কলেজে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান পড়ানোর জন্য ইউরোপীয় অধ্যাপক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়।

১৮২৪ সালে কোলকাতা মাদ্রাসার জন্যও একটি আলাদা ভবন নির্মিত হয়। ইংরেজি ভাষার বিভিন্ন বই অনুবাদ ও মুদ্রণ করে মাদ্রাসায় ইউরোপীয় বিজ্ঞান শিক্ষার অন্তর্ভুক্তির প্রচেষ্টা চালানো হয়। এছাড়া মুসলিম আইন বিষয়ক এবং স্বাস্থ্য বিষয়ে মেডিক্যাল ক্লাস চালু করা হয়। তবে ১৮২৮ সালের পূর্ব পর্যন্ত মুসলিম ছাত্রদের অনাগ্রহের কারণে কোন ইংরেজি ক্লাস চালু করা সম্ভবপর হয়নি। পক্ষান্তরে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। এর মধ্য দিয়ে ইউরোপীয় ও হিন্দু শিক্ষার যে সম্মিলন ঘটে তাতে ভারতবর্ষে বিজ্ঞান ও সাহিত্য চর্চায় ব্যাপক প্রসার লাভ করবে বলে প্রতীয়মান হয়।[২৭] ফলে জনশিক্ষা কমিটির তত্ত্বাবধানে হিন্দু কলেজ বেসরকারি মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেই ব্যাপক উন্নত হতে থাকে। সরকারও নতুন করে ইংরেজি কলেজ স্থাপনের পরিবর্তে নব উদ্দমে হিন্দু কলেজের পরিচর্যায় মনোনিবেশী হয়ে উঠে। এর ফল দাঁড়ায়- ১৮৩০ সালের দিকে ইংরেজি সাহিত্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর ইউরোপীয় স্কুলের ছাত্রদের চেয়েও হিন্দু কলেজের ছাত্রদের পারদর্শিতায় অধিক অগ্রগতি দেখে জনশিক্ষা কমিটি অভিভুত হয়ে গিয়েছিল।[২৮] তবে ১৮২৪ সালে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা ছিল সরকারের গৃহীত প্রথম ও প্রধান শিক্ষা প্রকল্পসমূহের অন্যতম। মাদ্রাসায় মুসলিম ছাত্রদের মতো রক্ষণশীল হিন্দুদের সংস্কারবাদী ভাবধারার সাথে সঙ্গতি রেখে সংস্কৃত কলেজেও ভর্তির ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ ছাত্রদের অগ্রাধিকার ছিল। হিন্দু কলেজের মতো সংস্কৃত কলেজে সাহিত্য, আইন, বেদান্ত, চিকিৎসাসহ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পাশাপাশি ঐচ্ছিক হিসেবে ইংরেজি পড়ানো হত। কিন্তু মাদ্রাসার মতো সংস্কৃত কলেজে ইংরেজি ক্লাস প্রবর্তনে সাফল্যের কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কারণ রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবার থেকে পরিষ্কার জানিয়ে দেয়া হয় ব্রাহ্মণ পরিবারের ইংরেজি পড়ুয়াদের পুজাঁ-পার্বনে পুরোহিত হিসেবে আর কখনো ডাকা হবে না।[২৯] ফলে সংস্কৃত কলেজে ইংরেজির পাঠদান বন্ধ করে দেয়া হয়। জনশিক্ষা কমিটি অনুধাবন করে যে, ভারতবর্ষে একজন ছাত্রকে এক সাথে দু'টো ভাষা আরবি-ইংরেজি কিংবা সংস্কৃত- ইংরেজি শিক্ষা দেয়া ফলপ্রসূ হবে না। তা সত্ত্বেও জনশিক্ষা কমিটি কোলকাতা মাদ্রাসায় মুসলিম ছাত্রদের ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সরকার সম্ভবত বুঝতে পেরেছিল যে, শিক্ষানীতির ফলাফল মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিকূলে প্রবাহিত হয়েছে। বাঙ্গালী হিন্দুদের পক্ষ থেকে আদালতে ফার্সির বদলে ইংরেজি অথবা মাতৃভাষা চালুর দাবীর প্রেক্ষিতে সম্ভবত শিক্ষা কমিটির এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা রেখেছিল।

ব্রিটিশ কোম্পানির শাসনের অর্ধশতক পার হলেও সুপ্রীম কোর্টের বাইরে সমস্ত অধস্তন আদালতের বিচারকার্যে ক্রমপরম্পরা রূপে ফার্সির ব্যবহার অব্যাহত থেকে যায়। পুরোনো অনেক বিষয়ের মত কোম্পানি সরকারও এ বিষয়ে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেনি। মুসলমান সমাজের প্রতি সরকারের এহেন আগ্রহ দেখে গোঁড়া হিন্দুরা বিষয়টিতে সাম্প্রদায়িক ও হিংসাত্মক মনোভাবের প্রকাশ ভঙ্গি দিয়ে অবান্তর উপায়ে মোকাবেলা করতে উদ্দত হয়। যার প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটে ২৬ জানুয়ারি ১৮২৮ সালে 'সমাচার দর্পন' এর সম্পাদকীয় নিবন্ধের মধ্য দিয়ে।[৩০] অতঃপর প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের 'দি রিফরমার', কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জির 'বেঙ্গল হরকরা' এবং রক্ষণশীল হিন্দুদের মুখপত্র 'সমাচার চন্দ্রিকা'র নিবন্ধে 'যবনদের' (মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশার্থে ব্যবহৃত) ঔদ্ধত্য কমানোর লক্ষ্যে এক প্রকার বিদ্রোপাত্মক মনোভাবের অশুভ বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর অপচেষ্টা চলতে থাকে।

এ রকম প্রেক্ষাপটে ১৮২৮ সালে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক গভর্নর জেনারেল হয়ে আসার পর বাংলার সামাজিক ও শিক্ষা সংক্রান্ত সংস্কার গতিপ্রাপ্ত হয়। জনশিক্ষা কমিটিও ফার্সি ভাষা বাতিলের চিন্তাভাবনা শুরু করে। তবে এ বিশাল পরিবর্তনে ইংরেজি শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব আরো অধিক সর্বজনীনতা, জনগণের স্বীকৃতি ও উপলব্ধিতে না আসা পর্যন্ত সরকারের কালক্ষেপন করা জরুরী[৩১] বলে অভিমত তুলে ধরা হয়। ফার্সির পরিবর্তে ইংরেজি প্রচলনের কর্মতৎপরতা নিয়ে ১৮৩০ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর লেখা পত্রে ইউটিলিটারিয়ান প্রভাবাধীন কোর্ট অব ডাইরেকটরস ক্ষোভের সাথে উল্লেখ করেন যে, অন্তত বিচার ব্যবস্থায় ইংরেজির পরিবর্তে স্থানীয়দের মাতৃভাষায় অর্থাৎ বাদী-বিবাদীর পরিচিত ভাষায় বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া উচিত।[৩২] এতে পুরোনো প্রথা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অনীহার বিশেষ মনোভাব প্রকাশ পায়। কোম্পানির সিদ্ধান্ত ছিলো জনসমর্থন তৈরি হলেই কেবল এ পরিবর্তনের পদক্ষেপ নেয়া উচিত। এদিকে হিন্দু কলেজের ব্যবস্থাপক, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, অভিভাবকবৃন্দ ও সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তনদের পক্ষ থেকে সরকারের নিকট স্মারকলিপি প্রদানের মাধ্যমে তাঁদের জীবন-জীবিকার তাগিদে পুরোনো শিক্ষা ব্যবস্থা বদলানোর আবেদন জানানো হয়। পাশাপাশি সংস্কারবাদী 'বেঙ্গল হরকরা', 'জ্ঞানান্বেষণ' ইত্যাদি পত্রিকাগুলোও দীর্ঘ নিবন্ধে সরকারি নীতির কঠোর সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠে। বাংলার হিন্দু সমাজের এ প্রতিক্রিয়ায় উইলিয়াম বেন্টিংককে তার নীতি বাস্তবায়নে অনেকটা সহায়তা করেছিল। অবশ্য তার শিক্ষানীতি কোনক্রমেই নিঃস্বার্থ ছিল না। এতদিন পর্যন্ত সরকারের উচ্চপদস্ত ইংরেজ কর্মকর্তা, যারা মেধা নয় পৃষ্ঠপোষকতার ভিত্তিতে অতি উচ্চ বেতনে এদেশে কর্মরত ছিলেন, তাদের স্থলে অনেক কম বেতনে এদেশীয়দের নিয়োগ দেয়া আবশ্যক হয়ে উঠে। যাতে ভারতবর্ষ শাসনে কোম্পানি সরকারের আর্থিক সুবিধা অর্জিত হয়। বেন্টিংক-এর নিকট বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতি লর্ড এলেনবরা'র এক ব্যক্তিগত পত্রে এ ভাবনার প্রতিধ্বনি প্রকাশ পেয়েছিল।[৩৩] বস্তুত প্রাচ্যমুখি শিক্ষানীতি দুটো ভিন্ন সংস্কৃতি ও দু'টো ভিন্ন যুগের অসম সমন্বয়ের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বিধায় ঐতিহ্যের ধারক-বাহক হিসেবে প্রাচ্য সংস্কৃতি পুরোনো ধ্যান-ধারণা ও রীতি-নীতি আকড়ে ধরে এগুতে চেয়েছিল। অন্যদিকে ভিন্ন এক ঐতিহাসিক ক্রমপরিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্য চিন্তা-চেতনা ও সংস্কৃতি গতিশীল এবং বিপ্লবাত্মক হয়ে উঠে পরিবর্তনশীল ও প্রতিযোগিতাধর্মী চিন্তা ও কর্মপরিকল্পনা তৈরিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।[৩৪]

লর্ড বেন্টিংক-এর প্রাচ্য বিমুখ মনোভাব, ভারতীয় হিন্দু সংস্কারবাদীদের সমালোচনামুখর কর্মতৎপরতা, সর্বোপরি বিপ্লবাত্মক ইউরোপীয় সংস্কৃতির বিকাশ এ সবের সমন্বয়ে ১৮৩৪ সালের দিকে জনশিক্ষা কমিটির অভ্যন্তরে একটি প্রভাবশালী পাশ্চাত্যপন্থী গোষ্ঠীর উত্থান ঘটে। তারা ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে

ব্যবহারোপযোগী, সমকালীন- বাস্তবধর্মী ও পাশ্চাত্যমুখী শিক্ষা প্রসারের জন্য একটি নব কর্মপদ্ধতি সূচনার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। সি. ই. ট্রেভেলিয়ান যার মধ্যে উপযোগবাদী ও মিশনারী দৃষ্টিভঙ্গি অপূর্ব সম্মিলন ঘটেছিল, এক্ষেত্রে তিনি বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। ট্রেভেলিয়ানের ধারণা, জনমত পুরোপুরি সচল ও সবলে অগ্রসর না হওয়া পর্যন্ত জাতীয় শিক্ষার ব্যাপারে বেন্টিংক তার মনোভাব প্রকাশ করতে দ্বিধান্বিত ছিলেন।[৩৫] কিন্তু ১৮৩৪ সালে টমাস ব্যাবিটন মেকলে (১৮০০-১৮৫৯) ভারতে এসে বেন্টিংক-এর পরিষদে অতিরিক্ত সদস্য হিসেবে যোগ দিলে পাশ্চাত্যপন্থী দলের অবস্থান অনেকখানি জোরদার হয়ে উঠে। পক্ষান্তরে ইতোপূর্বে অক্সফোর্ডে বোডেন অধ্যাপক হিসেবে যোগদানের জন্য এইচ. এইচ. উইলসন ভারত ত্যাগ করায় প্রাচ্যবাদীদের অবস্থান দুর্বল হয়ে আত্মরক্ষামূলক পর্যায়ে যেতে বাধ্য হয়। পাশ্চাত্যবাদীদের তৎপরতায় ১৮৩৪ সালের ২৬ এপ্রিল মাদ্রাসা বিষয়ক সাব-কমিটিতে সরকারি বৃত্তির জন্য আবেদনকারী ছাত্রদেরকে আরবিসহ ইংরেজি পাঠে সম্মতি প্রদান করতে হবে- এ মর্মে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবাদীদের মধ্যে গুরুতর দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। সাব-কমিটির সদস্য এইচ. টি. প্রিন্সেপকে উক্তসভায় আমন্ত্রণ না জানানোর ফলশ্রুতিতে এইচ.টি. প্রিন্সেপ এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করে একে অবিবেচনাপ্রসূত ও বিশ্বাস-ভঙ্গের চূড়ান্ত পর্যায় বলে অভিহিত করেন।[৩৬] অবশ্য এর আগেও প্রাচ্যবাদী সমর্থক জন টাইটলার ও এইচ. টি. প্রিন্সেপ'র সাথে সংবাদপত্রে তথ্য প্রকাশের বিষয় নিয়ে সি. ই. ট্রেভেলিয়ানের সাথে তুমুল বিতর্কের সূত্রপাত ঘটেছিল।

উইলিয়াম বেন্টিংক এ সব সংঘাত এড়িয়ে টি. বি. মেকলেকে জনশিক্ষা কমিটির সভাপতি পদে নিয়োগ দেন। কোলকাতার লর্ড বিশপকে লেখা এক পত্রে বেন্টিংক মেকলের ভূয়সী প্রশংসা করেন। মেকলে সম্পর্কে বেন্টিংক এর পূর্ব ধারণা থাকায় মেকলের নীতি ও সিদ্ধান্তসমূহ বেন্টিংকর উপর বিশেষ প্রভাব রাখতে শুরু করে। এতদসত্ত্বেও সরকার মনে করে যে, দেশের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবগত না হয়ে কোন সিদ্ধান্তে আসা সমীচিন হবে না। তাই সরকার একেশ্বরবাদী মিশনারী উইলিয়াম এ্যাডামকে বাংলা- বিহারের শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্য অনুসন্ধানের জন্য বিশেষভাবে নিয়োগ দান করে। পাশাপাশি বাংলার চিকিৎসা সম্পর্কিত বিষয়ে তদন্তের জন্য ডাঃ জেমস্ গ্রান্ট এর নেতৃত্বে জি.সি.সি. সাদারল্যান্ড, সি. ই. ট্রেভেলিয়ান, টমাস সেপনস, ডা. এম. জে. ব্রামলি ও রামকমল সেনকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির একটি সমন্বিত প্রতিবেদন এবং ১৮৩৫ সালে ২৮ জানুয়ারি গভর্নর জেনারেল ইন-কাউন্সিলের প্রস্তাব মোতাবেক কোলকাতা মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজে মেডিক্যাল ক্লাসসমূহ বন্ধ ঘোষণা করে কোলকাতায় একটি স্বতন্ত্র ও নতুন মেডিকেল কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১ জুন ১৮৩৫-এ নব প্রতিষ্ঠিত মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষাক্রম চালু করা হয়।[৩৭] জনশিক্ষা কমিটির প্রাচ্য ও পাশ্চান্তপন্থীদের মধ্যে চলমান বিরোধ নিরসন করে সরকার একটি বাস্তব ও যুগপোযোগি সমাধানে উপনীত হতে গভর্নর জেনারেল-ইন-কাউন্সিল সদস্য এবং জনশিক্ষা কমিটির সভাপতি হিসেবে টি. বি. মেকলেকে চূড়ান্ত মতামত দিতে বলা হয়। মেকওলে ছিলেন একজন বাস্তববাদী বুদ্ধিজীবী, সাম্রাজ্যের স্বার্থ তিনি সুস্পষ্টরূপে হৃদয়াঙ্গম করেছেন, যা আমলাদের চেয়েও একধাপ এগিয়ে ছিল। অনেকে অভিযোগ করেন ট্রেভেলিয়ান কোলকাতায় মেকলের বোনকে বিয়ে করেছিলেন। তাই তার উপর ট্রেভেলিয়ানের প্রভাব বিরাজমান ছিল। কিন্তু এ প্রস্তাবের পাঁচ বছর আগে ১৮৩০ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে এক বক্তৃতায় মেকলে বলেছিলেন রাজদণ্ড হস্তচ্যুত হতে পারে, অতি গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালার স্খলন ঘটতে পারে, কিন্তু যে একটি বিজয় চিরদিন টিকে থাকবে, তা হল সাংস্কৃতিক বিজয়। বস্তুত সকল সাম্রাজ্যেরই পতন হয়, অটল থাকে শুধু সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্য। সুতরাং ইউরোপীয় জ্ঞানে সুশিক্ষিত হলে ভারতীয়রাও একদিন ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চাইবে। সেদিন যদি কখনো আসে তা হবে ইংরেজদের জন্য সবচেয়ে গৌরবের দিন।[৩৮] তাছাড়া প্রাচ্যবাদী শিক্ষানীতি ছিল

তার কাছে এক অনাকাঙ্খিত সমঝোতা মাত্র। কাজেই ১৮৩৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি পাশ্চাত্যবিদ্যার পক্ষে তার বহুল আলোচিত প্রস্তাবটি পেশ করেন। একই সাথে উল্লেখ করেন- আরবি ও সংস্কৃত গ্রন্থসমূহ মুদ্রণ এবং কোলকাতা মাদ্রাসা ও কোলকাতা সংস্কৃত কলেজ বন্ধ করে দেয়া হোক। তবে বেনারস সংস্কৃত কলেজ ও দিল্লী কলেজ-এ দুটো সংস্কৃত ও আরবি শিক্ষায়তন হিসেবে বহাল থাকতে পারে। শর্ত হল এ দুই প্রতিষ্ঠানে প্রাচ্যশিক্ষা গ্রহণে ইচ্ছুক ছাত্ররা কোন বৃত্তিপ্রাপ্ত হবে না। তার মতে বৃত্তি হলো উৎকোচ পাবার মতোই। তাই আগ্রহীগণ দুটো প্রতিদ্বন্দ্বী শিক্ষার মধ্য থেকে স্বাধীনভাবে একটিকে গ্রহণ করতে পারবে। শিক্ষার জন্য বরাদ্দকৃত সব অর্থ কোলকাতা হিন্দু কলেজের উন্নয়ন এবং ফোর্ট উইলিয়াম ও আগ্রা প্রেসিডেন্সির সর্বত্র প্রধান শহরগুলোতে ইংরেজি শিক্ষা দেবার উপযোগী পূর্ণাঙ্গ স্কুল প্রতিষ্ঠায় ব্যয়িত হওয়া উচিত। প্রস্তাবের আরেক অংশে প্রাচ্যপন্থি নীতির স্বপ্নসৌধটি উড়িয়ে দিতে গিয়ে প্রাচ্যবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বলেন যে, তারা ১৮১৩ সালের অ্যাক্টে এ শিক্ষা সম্পর্কিত অনুচ্ছেদের ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলেন। শিক্ষার জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ কোথায় ও কিভাবে ব্যবহৃত হবে অ্যাক্টে এই বিষয়ে কোন-নির্দেশনা ছিল না, যাতে সরকার স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এখন সরকারের উচিত হবে ফার্সি ও সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে অনেক বেশি কার্যকর ইংরেজি শিক্ষার জন্য ব্যয় করা। তার অভিমত ছিল ফার্সি ও সংস্কৃত হল মৃত ভাষা, যার মাধ্যমে False History, False Astronomy, False Medicine, False Religion শিক্ষা দেয়া হয়। আরো দম্ভ করে বলেছেন তার কাছে সংস্কৃত ও আরবি ভাষায় রচিত সমস্ত জ্ঞান সাহিত্যের মূল্য ভাল কোন ইউরোপীয় গ্রন্থাগারের একটি মাত্র আলমারিতে রাখা বইয়ের মূল্যের চেয়ে কখনো বেশি হবে না।[৩৯]

টি. বি. মেকলের প্রস্তাবের সাথে উইলিয়াম বেন্টিংক একাত্মতা প্রকাশ করলেও অন্যসব মহল থেকে সমালোচনার ঝড় উঠে। কার্যত তার প্রস্তাবটি পুরোনো বিরোধ মীমাংসার পরিবর্তে আরেকটি নতুন বিরোধ সৃষ্টি করেছিল। মেকলে অত্যন্ত চতুরতার সাথে এবং মেধার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে ট্রেভেলিয়ানের দৃষ্টিভঙ্গিই শুধু প্রকাশ করেননি; একই সাথে প্রগতিবাদী হিন্দুদের অভিমত বিশেষত ১৮২৩ সালে গভর্নর জেনারেল আমহার্স্ট এর নিকট রামমোহন রায়ের লেখা পত্রটির অভিব্যক্তিও প্রকাশ করেছিলেন। এছাড়া ১৮১৩ সালের অ্যাক্টে নিয়ে মেকলের বক্তবে এ্যাকট পূর্বাপর ঘটনা ও তথ্যাদি সম্পর্কে তার অজ্ঞতার শুধু বহিঃপ্রকাশই ছিল না, বরং ইতোপূর্বে বাঙ্গালি সংস্কারপন্থী কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় ও রসিকচন্দ্র মল্লিকের বিদ্বেষ ছড়ানো নিবন্ধের অবিকল রূপায়ন বলে অনেকখানি সমালোচিত হয়। তাই বলা যায়, প্রস্তাবটিতে নতুন করে কোন বিষয় তুলে ধরা হয়নি, তেমনি কোন নীতিও নতুন করে আরোপিত হয়নি। এমনকি বিতর্কিত বিষয়টিরও কোন সুরাহা এতে উল্লেখিত ছিল না।[৪০] তবে তার প্রস্তাবে পুরোনো নীতিমালার নতুন ব্যাখ্যা আরোপের একটি প্রবণতার প্রতিফলন ঘটেছিল। তার সাথে ইংরেজপন্থী মতের তাত্ত্বিক ভিত্তি ও গ্রহণযোগ্যতার একটি বাস্তব রূপরেখা তৈরি করে দিয়েছিল। মেকলের ধারণা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রগতিবাদী ও সংস্কারপন্থী হিন্দু জনগোষ্ঠী তার প্রস্তাব বিনাদ্বিধায় লুফে নেবে। তাই তিনি কৌশলে গভর্নর বেন্টিংকে দিয়ে জনশিক্ষা কমিটির কার্যবিবরণী জনমত সৃষ্টির জন্য নিয়মিত প্রকাশ করার চেষ্টা চালান, যেন জনগণ সরকারের কর্মকাণ্ডে উদ্বুদ্ধ হয়।[৪১]

সরকারের প্রাচ্যবিরোধী শিক্ষানীতি প্রণয়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ প্রত্যক্ষ করে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। শিক্ষা বিষয়ক সাব-কমিটির প্রভাবশালী সদস্য এইচ.টি. প্রিন্সেপ ৩০ বছর পর তার স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেন যে, সরকারের সংস্কৃত কলেজ ও কোলকাতা মাদ্রাসার মেডিক্যাল ক্লাস বন্ধ ঘোষণা এবং মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজ বন্ধ করে দেবার প্রস্তাবে কোলকাতার হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সাধারণ জনগনের মধ্যে খুব দ্রুত ক্ষোভের সঞ্চার করে। মাদ্রাসা চালুর পক্ষে লিখিত একটি

দরখাস্তে তিন দিনের মধ্যে কমপক্ষে ৩০,০০০ লোকের স্বাক্ষর সংগৃহীত হয়। সংস্কৃত কলেজ চালু রাখার বিষয়েও অনুরূপ স্বাক্ষর সম্বলিত আরেকটি দরখাস্ত প্রস্তুত করা হয়।[৪২] এ দুটো আবেদন গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিলের নিকট পেশ করে সরকারি শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের বিপক্ষে জোড়ালো দাবি উত্থাপন করা হয়। বিশেষত মুসলমান সমাজের আবেদনে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় আকস্মিকভাবে তারা যে সংকটময় পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে তার সকরুণ আকুতি প্রকাশ পেয়েছিল। মুসলমানদের ভয় যে অমূলক নয়, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। মাদ্রাসা বন্ধ, বিচারকার্যে ফার্সি ভাষার অবলুপ্তি, বিচার প্রক্রিয়ার পূণঃবিন্যাস ইত্যাদি সবই সরকারের পাশ্চাত্যনীতির বহিঃপ্রকাশ হিসেবে চিহ্নিত, যা সম্পূর্ণ আঙ্গিকে মুসলমানদের প্রতিকূলেই কার্যকর হবে। সুতরাং মুসলিম জনমতের বাস্তব প্রতিফলনের উন্মুক্ত নমুনা হিসেবে দরখাস্তটি একটি প্রামাণ্য ও গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে বিবেচিত হয়। মুসলমানদের আবেদনটি বিফলে যায়নি, বরং সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে এটি বেশ প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। অতঃপর হিন্দু ও মুসলমান সমাজের দাবীসমূহ বিবেচনায় রেখে ১৮৩৫ সালের ৭ মার্চ একটি রেগুলেশন দ্বারা বহুল আলোচিত শিক্ষা সংক্রান্ত প্রস্তাবটি গভর্নর জেনারেল ইন-কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে ব্রিটিশ কোম্পানি সরকারের শিক্ষানীতি হিসেবে ঘোষিত হয়। অবশ্য বেন্টিংক কর্তৃক পূর্ণাঙ্গরূপে অনুমোদিত প্রস্তাবে মেকওলের খসড়া প্রস্তাবের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছিল। কাউন্সিল দ্বারা সর্বশেষ ও চূড়ান্ত ঘোষণায় বলা হয় সরকার দেশীয় চলমান কোন কলেজ বা মাদ্রাসা বন্ধ করবার ইচ্ছে পোষণ করে না। শিক্ষা কমিটির তত্বাবধানে পরিচালিত সবকটি প্রতিষ্ঠানের বর্তমান ছাত্র-শিক্ষকগণ প্রচলিত ও পুরোনো নিয়মে বৃত্তি ভোগ করে যেতে পারবেন। তবে নতুন করে হিন্দু-মুসলিম কোন ছাত্রকে বৃত্তি প্রদান এবং আর কোন প্রাচ্য বই-কিতাব মুদ্রণ করা হবে না। শুধু ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে জনগণকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-সাহিত্য শিক্ষা দানের জন্য সমুদয় অর্থ ব্যয়িত হবে।

অতঃপর নীতি নির্ধারণ করে তা বাস্তবায়নের জন্য মেকওলের পরামর্শে[৪৩] জনশিক্ষা কমিটি পুন:গঠন করা হয়। কমিটির সদস্য হিসেবে নতুন নীতির উৎসাহী সমর্থক স্যার এডওয়ার্ড রায়ান, সি.এইচ. ক্যামেরন, স্যার বেঞ্জামিন ম্যালকিন, রস ম্যাংগলস, জেমস ইয়াং এবং ক্রিস্টোফার স্মিথকে নিয়োগ প্রদান করা হয়। এরা সবাই পশ্চিমা নাগরিক ছিলেন বিধায় সরকার কমিটিকে সর্বজনীন ও প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্রে রূপায়নের নিমিত্তে কয়েকজন ভারতীয়কেও সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মেকলে হিন্দু কলেজের ম্যানেজারদের মধ্য থেকেই দু'জনকে নিয়োগের পরামর্শ দিলেও সরকার রাধাকান্ত দেব ও রসময় দত্তের সাথে মুসলিম প্রতিনিধি হিসেবে নবাব তহবর জংকে নিয়োগ দিয়ে সদস্য হিসেবে ইউরোপীয়দের সাথে সংযুক্ত করে নেয়।[৪৪]

কোম্পানি সরকারের নতুন শিক্ষানীতি প্রনয়নের সময় গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক উদারনৈতিক ভাবধারা ও বাস্তব বিবেচনাপ্রসূত চেতনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন বলে ধারণা করা হয়। কিন্তু কোম্পানি সরকারের পূর্বাপর কর্মধারা বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, লর্ড বেন্টিংকের ভাবনার আড়ালে কোম্পানির আর্থিক ব্যবস্থাপনা তথা লর্ড ক্লাইভের মৌলিক বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যবাদী নীতি এবং সি. ই. ট্রেভেলিয়নের উপযোগবাদী ও মিশনারী শক্তি বিপুল সমারোহে অনুপ্রাণিত হয়েছিল।[৪৫] এছাড়াও সরকারি নীতি নির্ধারনের ক্ষেত্রে লর্ড বেন্টিংক তার বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা অনুধাবন করতেন হাওয়া কোনদিকে প্রবাহিত হচ্ছে, ভারতীয়দের সংখ্যাগরিষ্ঠ মনোভাব কোনদিকে প্রতিফলিত হচ্ছে। মেকলের নিয়ন্ত্রণাধীন ইংরেজপন্থীরা তাদেঁর প্রস্তাবের অন্তরালে রামমোহন রায়ের মতানুসারী, প্রগতিবাদী ও সংস্কারপন্থীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকার রক্ষণশীলদের সমর্থনের উপর নির্ভর করতে উদগ্রীব ছিল বলে মনে হয়। গোঁড়া, রক্ষণশীল ও ধর্মসভার সদস্য হিসেবে রামকমল সেন, রাধাকান্ত দেব, রসময় দত্ত প্রমুখরা আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় প্রভাব হেতু ব্যাপক

জনগোষ্ঠীর সহানুভূতি লাভ করতেন। সরকারও সে সহানুভূতির ভাগিদার হতে তৎপর ছিলেন। যে কারণে সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ বাস্তবায়নে সরকারকে যে পরিমাণ রক্ষণশীল হিন্দুদের বিরোধিতার মোকাবেলা করতে হয়েছিল, নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সেই রক্ষণশীল জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে সরকার অনুরূপ সহায়তা ও সমর্থন অর্জন করতে পেরেছিল।

বলা বাহুল্য, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনপূর্ব সময়ে এদেশে টোল ও মক্তব কেন্দ্রিক প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় কোম্পানি সরকার অনেক পরিবর্তন নিয়ে আসে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করে আরবি, ফার্সি, সংস্কৃত, ইংরেজি ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা প্রদানের জন্য মাদ্রাসা ও কলেজ স্থাপনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তৈরি করে দেয়। তবে জনগণ ব্যাপক হারে শিক্ষিত হয়ে উঠুক, এ রকম ভাবনা কখনো ছিল না। তাই শিক্ষাকে একটি শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার ক্ষেত্রে উদারনৈতিক কর্মপন্থা চালু করার প্রচেষ্টা শুরু হয়। তা হল পানির মতো শিক্ষাকেও উপরে ঢালা হলে তা নিচে গড়িয়ে পরবে (Donon word Filtration Theory)। এভাবে ঢেলে এমন একটি শ্রেণি তৈরি হবে যারা জনগণকে শোষণ করার ব্যাপারে শাসক গোষ্ঠীকে অবিরত সহায়তা দিয়ে যাবে। মূলত এটিই ছিলো ইংরেজ শাসক শ্রেণির প্রকৃত অভিপ্রায়। প্রথমে আড়ালে থাকলেও মেকলের প্রভাবাধীন শিক্ষা নীতির প্রস্তাবে তা একেবারে প্রকাশ্য রূপ নেয়। শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্ত আয়োজনের পেছনে তাই আসল স্বার্থ দাঁড়ায় স্থানীয়দের অধীনে রাখা এবং একই সাথে ব্রিটেনে উৎপাদিত পণ্যের স্থানীয় বাজার সৃষ্টি করা। কারণ কোম্পানি ভারত আগমনের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্যই তো ছিল বাণিজ্য সম্প্রসারণ। এ লক্ষ্য স্থায়ীকরণের জন্য প্রয়োজন ছিল ভারতীয় সমাজের উপর শোষণ ও শাসন নীতির প্রয়োগ ঘটানো। এতে ব্রিটিশ জনগোষ্ঠী ও ব্রিটিশ সরকারের সংশ্লিষ্টতাও যে অতি আবশ্যকীয় তা বলা বাহুল্য। মেকওলে ও তার সংশ্লিষ্টরা নতুন শিক্ষা নীতি প্রণয়নের ভিতর দিয়ে পরবর্তী ব্রিটিশ আধিপত্যবাদী নীতি বাস্তবায়নে চূড়ান্ত রূপ প্রদানে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায় যে, কোম্পানি সরকার প্রবর্তিত নতুন শিক্ষানীতি অনেক ক্ষেত্রেই পরিবর্তন নিয়ে আসে। নতুন করে সমাজে বৈষম্যও তৈরি করে। সব ভারতীয়দের শিক্ষিত করে তোলার কিছু মতামত আসলেও মেকলের নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত হলো সবাইকে শিক্ষিত করে নয়, বরং কাজটি হবে একটি শ্রেণিকে শিক্ষিত করা। যারা আমাদের আজ্ঞাবাহী থাকবে শুধু তাদের নিজেদের স্বার্থেই। মেকওলে কোলকাতায় এসেছিলেন মূলত গভর্নর জেনারেলের আইন বিষয়ক পরামর্শদাতা হিসেবে। ১৮৩৫ সালে তিনি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের পাশাপাশি সরকারের পেনাল কোডও তৈরি করে দিয়েছিলেন। মেকলের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল ভারতীয়দের ইংরেজি ভাষার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তোলা। যার ফলে ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলোতে কোলকাতাবাসী তরুণদেরকে নিরন্তর প্ররোচনা দেয়া হচ্ছিল। এতে করে মধ্যবিত্ত শ্রেণির তরুণরা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উৎফুল্ল বোধ করেছে, গর্বিতও হয়েছে ব্যাপক হারে। ইংরেজির প্রভাবে অনেক তরুণ আবার ইংরেজও হতে চেয়েছিল। যেভাবে মধুসুদন দত্ত 'মাইকেল' হয়েছিলেন। কিন্তু ইংরেজ সমাজ ব্যর্থতাবোধের গ্লানি মাখিয়ে তাকে স্বদেশ ভূমিতে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছে। মেধার কারণে মুধুসুদন দত্ত পিতৃভূমিতে পূনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অনেকে আবার ব্যর্থ হয়েছেন। এভাবে হাজারো তরুণ 'সাহেব' হতে গিয়ে বাঙ্গালীর গর্বিত স্বকীয়তাকে বিসর্জন দিয়েছে। অকাতরে আত্মসমর্পন করে নিজস্ব স্বত্তাকে বিলীন করে দিয়েছে। যে কারণে ইংরেজদের পেশাদার অশিক্ষিত, কম শিক্ষিত নিয়মিত ভারতীয় সৈনিকদের একটি বড় অংশ ১৮৫৭ সালে বিদ্রোহ করেছিল। কিন্তু শিক্ষিত বাঙ্গালি বাবুরা মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য তেমন কিছুই করতে পারেনি। বরং

তোষামোদির মাধ্যমে ইংরেজ শাসন দীর্ঘায়ু করতে বাড়তি উৎসাহের সাথে ইংরেজদের শিক্ষা গ্রহণের দিকে অধিক মনোনিবেশ করেছিল। তাই বলা যায় ১৮৩৫ সালে শিক্ষানীতি প্রণয়নে মেকলের প্রস্তাব, অতঃপর ১৮৩৭ সালে দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ফার্সির পরিবর্তে ইংরেজি ভাষা প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে আত্মসমর্পনের যে বিষবৃক্ষ বপিত হয়েছিল, তার উৎকৃষ্ট ফল ছিল এই বাঙ্গালি শিক্ষিত শ্রেণি। যারা কোম্পানি শাসিত ভারতবর্ষে অপেশাদার, অনিয়মিত বাহিনীর সমান্তরাল ভূমিকা পালন করেছিল। যেভাবে ১৭৯৩ সালে ভূমির উপর স্থায়ী বন্দোবস্ত কায়েম হয়েছিল, তেমনি ১৮৩৫ সালের শিক্ষা নীতি ভারতীয়দের মনের উপর স্থায়ী বন্দোবস্তের ব্যবস্থা হয়তো হয়ে গিয়েছিল। ভূমির ব্যবস্থাপনা নীতির উপর সমালোচনা করা গেলেও মনের বন্দোবস্তের উপর সমালোচনা অত্যন্ত জটিল বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

অন্যভাবে বলা যায় মেকলে ব্রিটিশদের বেতনভুক্ত নিয়মিত ও শৃংখলিত স্বশস্ত্র বাহিনীর উপর ভরসা করতে পারেননি। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষিতদের উপর নিরংকুশ ভরসা করেছিলেন। শিক্ষার মাধ্যমে উৎপাদিত যে মানুষটি তৈরি হবে তার দ্বারা কখনো সমস্যা সৃষ্টি হবে না, বরং সাম্রাজ্যকে চিরস্থায়ী রূপ দানে সহায়ক শক্তি হিসেবে সদা কার্যকর থাকবে। ১৮৫৭ সালের পর পুনরায় বিদ্রোহের আশঙ্কা করেছিলেন অনেকেই। কিন্তু সে বিদ্রোহটি আর ঘটেনি কখনো। প্রায় দু'শ বছর ধরে চলমান সাম্রাজ্য একদিন বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে কিন্তু সাংস্কৃতিক আধিপত্য এখনও পর্যন্ত অবলুপ্ত হয়ে যায়নি। ব্রিটিশদের কাছ থেকে বাংলা- ভারত স্বাধীন হয়েছে ঠিকই, ব্রিটিশ শিক্ষা পদ্ধতি, আইন-কানুন, অফিস-আদালত, আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনাদি এবং ইংরেজি ভাষার আধিপত্য এখনো বহাল তবিয়তে বিদ্যমান আছে। অর্থাৎ মানুষ ও শাসকগোষ্ঠীর রং বদলিয়েছে, ব্যবস্থাদির রং-এ তেমন কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না। বরং ভিন্ন আঙ্গিক নিয়ে এখনো বিপুল শক্তিতে বিরাজমান রয়েছে।

অতএব দেখা যায়, ভারতবর্ষে তুর্কী আগমনের পর থেকে হিন্দু-মুসলিম বিভাজন রেখা ক্রমশ উজ্জ্বলতর হতে দেখা যাচ্ছিল। আসলে আত্মসচেতন সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যবোধের বিকাশের চেতনাটি এসেছিল ইউরোপ থেকেই। মার্টিন লুথারের ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের ভেতর দিয়ে এই জাতিগত স্বাতন্ত্র্যবোধের নবীন জাগরণের সূচনা ঘটেছিল। ব্রিটিশ শাসক শ্রেণিও তাদের শাসন কাঠামো মশ্রিণ করবার লক্ষ্যে হিন্দু-মুসলমান দু'গোষ্ঠীর মধ্যে আন্তঃসম্প্রদায়িক শ্রেণি বৈষম্য তৈরিতে বিশেষভাবে কার্যকর বন্দোবস্ত সুসম্পন্ন করেছিল। ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থায় নতুন করে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থান তরান্বিত হয়। ফলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অসম প্রতিযোগিতা এবং একই সাথে উপরে উঠার প্রতিদ্বন্দ্বীতা তৈরির মানসিকতা প্রকট আকার ধারণ করেছিল। এতে করে হাজার বছর ধরে একই সাথে বসবাসরত উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে ব্রিটিশ শাসক শ্রেণি সুনিপুনভাবে সাম্প্রদায়িকতার কলুষিত ভাব-চেতনা জাগ্রত করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখে। যা এখনো মহামারির জীবাণুর মতো হিন্দু-মুসলিম উভয় শ্রেণির মনোজগতে স্থায়ীভাবে বাসা বেঁধে আছে।

তথ্যসূত্র:

১. Krishna Kumar, *Political Agenda of Education*, Delhi. 1991, p.54
২. 'Minutes of Indian Education', *Speeches by Lord Macaulay* (Complied G.M. Young) London, 1935, p.359
৩. T. B. Macaulay, 'Warren Hastings', *Critical and Historical Eassays*. *vol-1* London, 1917, p.562
৪. T. B. Macaulay, *Ibid*, p. 563
৫. *Rules of Vidyalaya or the Hindu College* Calcutta, 1816, p.9

৬. *Bengal Secret Consultation No-1*. 22 June, 1795
৭. *R. Heber, Narrative of a Journey through the Upper Province of India from Calcutta to Bombay*. 1824-25 (London 1871), p.238
৮. W.W. Hunter, *The Indian Musalman* (London 1871), p.187
৯. T. B. Macaulay, English Education and the Origins of Indian Nationalism (New York 1940), p.12
১০. P. Hartog. *Some Aspects of Indian Education, Past and Present.* (Oxford. 1939), p.05
১১. C. Buchanan. *The College of Fort William Bengal*. (London 1805), p.239
১২. Majyhew. *Education of India*. (London. 1926), p.290
১৩. Sir E. Rayan to Lord William Bentinck, 27 January 1832, *Bentinck Papers*, p.19-21
১৪. *Public Despatch to Bengal*, 3 June, 1814, Paras, 13, 14
১৫. Minute by Lord Hasting (Moira) 2 October 1815 on the Judicial administration of the Presidency of Fort William, Paras 119.120
১৬. Minute by Lord Hasting-, *Ibid*, para 121, 125
১৭. Parliamentary Papers, House of Commons. 1831-32, IX, 7351, p.397
১৮. Parliamentary Papers- *Ibid*, p.398
১৯. Sir E Rayan- *Op. Cit.*, p.79
২০. P. Hartog- *Op. Cit.*, p.16
২১. Sir E Rayan- *Op. Cit.*, p.53
২২. Sir E Rayan- *Ibid*, p.69
২৩. C. E. Trevelyan, *On the Education of the People of India* (London,1838), p.71
২৪. B. K. Boman-Behram, *Educational Controversies in India*. (Bombay, 1943)
২৫. George D. Bearce, *British Attitude towards India. 1784-1858* P-55 (Oxford 1961), p.282
২৬. *Despatch to Bengal*, 18 February 1824, para. 82
২৭. S. E. Rayan. *Op. Cit.*, p.87
২৮. *Report of the General Committee of Public Instruction in Bengal*, 1831 (Calcutta 1832), p.4
২৯. *সমাচার চন্দ্রিকা*, ২৬ এপ্রিল ১৮৩১
৩০. *সমাচার দর্পন*, ২৬ জানুয়ারি ১৮২৮
৩১. *Letter from Bengal*, 21 August 1829, para-50
৩২. *Public Despatch to Bengal*, 29 September 1830, para-29
৩৩. Ellen borough to Bentinck, 23 September 1830, *Bentinck Papers*
৩৪. T. G. P. Spear. "Bentinck and Education" Cambridge Historical Journal, vi. 1, 1938, p.87
৩৫. C. E. Trevelyan to Lord William Bentinck. 9 April, 1834 *Bentinck Papers*
৩৬. Sir E Rayan- *Op. Cit.*, p.103
৩৭. *Report G. C. P. I.* p.49
৩৮. *Speeches by Lord Macaulay, Op. Cit.*, p.115
৩৯. *Speeches by Lord Macaulay, Op. Cit.*, p.349
৪০. T. G. P. Spear, *Op. Cit.*, p.85
৪১. Macaulay to Lord William Bentinck, 5 February 1835, *Bentinck Papers*
৪২. India Public Consultation, No-9, 13, March 1835
৪৩. Macaulay to Lord William Bentinck, 7 February 1835, *Bentinck Papers*
৪৪. *Report G. C. P. I.* iii p-1835
৪৫. K. A. Ballharhet, The Home Government and Bentinck's Education Policy *Cambridge Historical Journal* x-2, 1951. p.228